রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ?

বিমান নাথ

বিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এমন কিছু নাম উঠে আসে যাদের কথা ভেবে মনে হয় যদি তাঁরা অন্য কোনও সময়ে, অন্য কোথাও জন্ম নিতেন বা কাজ করতেন তাহলে কেমন হত? যেমন প্রাচীন গ্রীক দেশের অ্যারিস্টার্কাস্, যিনি প্রথম পৃথিবী থেকে চাঁদ আর সূর্যের দূরত্ব বার করতে পেরেছিলেন, এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে কোপার্নিকাসের অনেক আগেই সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর ঘোরার কথা বলেছিলেন। যেমন নিকোলা টেস্‌লা, যাঁর বিদ্যুত এবং চুম্বক সম্বন্ধীয় আবিষ্কারগুলো এক সময় সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তখনকার দিনের প্রভাবশালী বিজ্ঞানী থমাস আলভা এডিসনের মতান্তর হয়েছিল বলে তাঁর কথা আজ খুব একটা আলোচনা হয় না। সাধারণ লোকজন টেসলার চেয়ে এডিসনের নামই বেশি জানে।

যেমন জগদীশচন্দ্র বসু। সম্প্রতি তাঁর গবেষণার কিছুটা পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও তাঁর অনেক গবেষণার কথা নিয়ে যতটুকু আলোচনা হওয়া দরকার, ততটা হয় নি বলে মনে হয়। প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯৮ সালে IEEE-র জার্নালে জগদীশ বসুর বেতার গ্রাহক যন্ত্রের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন [১]। তার পর এখন সবার মনে জগদীশ বসু একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন। মার্কনির যন্ত্রটা যে আসলে জগদীশ বসুর উদ্ভাবন এটা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে এখন আর কোনও সংশয় নেই। এই সম্মান তাঁর অনেক আগেই পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এইটুকুও যে ইতিহাসের প্রায় অতল কুঠুরি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে সেইটাই বড়ো কথা।

কিন্তু জগদীশ বসু যে শুধু বেতারে খবরাখবর পাঠানো নিয়েই ভাবছিলেন না, তিনি যে বেতার তরঙ্গের গ্রাহকযন্ত্র নির্মাণের প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন, তার কথা তেমন শোনা যায় না, কারণ সেই ব্যাপারে মার্কনি-না-বসু এমন রসালো বিতর্কের উপকরণ নেই। ১৯৯৭ সালে একজন অ্যামেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড্যারেল্ এমারসন IEEE-এরই একটা গবেষণা পত্রিকায় জগদীশ বসুর মিলিমিটার বা মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ নিয়ে গবেষণার কথা বিশদ ভাবে আলোচনা করেছেন [২]। তিনি সেই প্রবন্ধে জগদীশ বসুর গবেষণার যে ফলাফলগুলো বর্তমানে রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সম্বন্ধে বিশদ ভাবে লিখেছেন। এই প্রবন্ধের সূত্র ধরে এখানে জগদীশ বসুর কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা লিখছি।

একটু গোড়া থেকে শুরু করা যাক। ১৮৮৭ সালে হাইনরিখ হার্ট্‌স্ প্রথম বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখালেন। তাত্ত্বিক দিক থেকে অবশ্য এর একুশ বছর আগেই জেমস্ ম্যাক্সওয়েল এই ধরণের তরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে বিদ্যুত এবং চুম্বকের মধ্যে একটা গভীর যোগাযোগ রয়েছে। যেমন একটা বিদ্যুত পরিবাহী তার একটা চুম্বকের মত লোহার টুকরো আকর্ষণ করতে পারে। আবার একটা চুম্বককে ঘোরালে তার চারিদিকে বৈদ্যুতিক বল দেখা দেয়। আমাদের সাইকেলের চাকায় এমন চুম্বক ঘুরিয়ে আমরা আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করে থাকি। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে বৈদ্যুতিক বা চুম্বকীয় বলের পরিবর্তন। একটাকে বদলালে সঙ্গে সঙ্গে তার যমজ ভাই এসে হাজির হয়।

ম্যাক্সওয়েল এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটা পরিস্থিতির কথা কল্পনা করলেন। যদি কোথাও বৈদ্যুতিক বল পাল্টায়, তখন তার চারিদিকে চুম্বকীয় বল তৈরী হবে। চুম্বকীয় বলের এই হঠাৎ আবির্ভাবও এক ধরণের পরিবর্তন। এবং এই পরিবর্তিত চুম্বকীয় বলের জন্য তার চার পাশে বৈদ্যুতিক বল দেখা দেবে। এমন করে একটা 'তরঙ্গ' বাইরের দিকে প্রসারিত হতে থাকবে। ১৮৮৭ সালে হার্টসের পরীক্ষা প্রমাণ করল যে এমন তরঙ্গ সত্যি তৈরী করা যায়। হার্ট্‌স্ দেখিয়েছিলেন কীভাবে এই ধরণের তরঙ্গ তৈরী করতে হয় এবং কীভাবে তার স্পন্দন একটা গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে ধরা যেতে পারে।

হার্টস্ যে মাপের তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে ছয় মিটার। তাঁর পরীক্ষার ফল ঘোষণার কয়েক বছরের মধ্যেই জগদীশ বসু এর চেয়ে কিছুটা কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন ছোট মাপের তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষার জন্য দরকার হবে ছোট সাইজের যন্ত্রপাতি, যেসব জোগাড় করা এবং অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। পরাধীন ভারতে তখনকার পরিস্থিতি বুঝেই হয়ত তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— কিন্তু এর ফলে তাঁর অজান্তে বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গের গবেষণায় একটা নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছিল।

তিনি ঠিক করলেন হার্টসের মত মিটার নয়— সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা করবেন। এটা হল আমরা যাকে আজকাল মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ বলি। জগদীশ বসুই প্রথম এই ধরণের তরঙ্গ তৈরী করা থেকে শুরু করে এর জন্য প্রয়োজনীয় গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি যখন পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্যা ছেড়ে গাছপালা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তার পর বেশ কয়েক দশক পৃথিবীতে কোথাও মাইক্রোওয়েভের গবেষণায় কোনও উন্নতি হয় নি। সবাই তখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বড় দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পাঠানো নিয়ে মেতে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজ্ঞানীরা আবার মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের গবেষণায় ফিরে এসেছিলেন— কিন্তু ততদিনে জগদীশ বসুর নাম ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গিয়েছিল। ঠিক অলিখিত না হলেও, অব্যক্ত রয়ে গিয়েছিল তাঁর অবদানের কথা।

যাই হোক, ১৮৯৭ সালে, অর্থাৎ হার্টসের পরীক্ষার এক দশকের মধ্যেই, জগদীশ বসু লন্ডনে রয়েল ইনস্টিটিউশনে তাঁর মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি শুধু এমন তরঙ্গ তৈরী এবং গ্রহণ করার যন্ত্র নিয়েই গবেষণা করেন নি— তিনি মার্কনি আর এডিসনের মত শুধু প্রযুক্তিবিদ ছিলেন না: তিনি ছিলেন একজন যথার্থ পদার্থবিদ (এই নিয়েই পরে এক সময় টেসলা এবং এডিসনের মধ্যে বিবাদ হয়)। তাঁর লক্ষ্য ছিল ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব সত্যি কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখা।

ম্যাক্সওয়েল যখন তাঁর তত্ত্বের সাহায্যে বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ অঙ্ক কষে বার করেছিলেন, তখন দেখা গেল সেটা আলোর গতিবেগের খুব কাছাকাছি। তাঁর অঙ্কের এই ফল সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল, কারণ আলোর সঙ্গে যে বিদ্যুত বা চুম্বকের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা তখন জানা ছিল না। অবশ্য তখন আলোর গতিবেগের মান খুব একটা ভাল করে জানা ছিল না। কিন্তু ম্যাক্সওয়েল অনুমান করেছিলেন যে এটা কাকতালীয় নয়। তাহলে কি আলো এক ধরণের বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ?

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটা উপায় হল বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে সাধারণ আলোর কতটুকু মিল বা অমিল রয়েছে সেটা পরীক্ষা করে দেখা। আমরা জানি যে আলোর প্রতিফলন-প্রতিসরণ হয়। বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গও কি এই সব নিয়ম মেনে চলে? জগদীশ বসু এই পরীক্ষাগুলোই করে দেখালেন মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ নিয়ে। আর এই পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি কীভাবে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের দিক পরিবর্তন বা তার তীব্রতা কমানো-বাড়ানো যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্র তৈরী করেছিলেন — যে বিষয়কে আজকাল মাইক্রোওয়েভ অপ্‌টিক্স বলা হয়। সাধারণ আলোর রেখাকে যেমন কাঁচের লেন্সের সাহায্যে এদিক ওদিকে নিয়ে যাওয়া যায়, তেমনি মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের দিক পরিবর্তন করতে হলে এটা প্রথমে জানতে হবে এই তরঙ্গ কোন পদার্থের মধ্যে কতটুকু প্রতিসরিত হচ্ছে— অর্থাৎ তার প্রতিসরাঙ্ক কত। জগদীশ বসু নানান পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, এবং তাদের ক্ষেত্রে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের প্রতিসরাঙ্ক মেপেছিলেন। এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তিনি গন্ধক (সালফার) দিয়ে মাইক্রোওয়েভের জন্য প্রিজ়ম তৈরী করেছিলেন। এই 'অদৃশ্য আলোর' জগত নিয়ে তিনি প্রায় এক দশক কাজ করে গিয়েছেন।

প্রথমে তিনি মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ তৈরীর জন্য একটা উন্নত মানের যন্ত্র বানানোর চেস্টা করেছিলেন। হার্টস্ বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরী করতেন দুটো তারের মধ্যে বিদ্যুতের ফুলকি বা স্পার্কের সাহায্যে। কিন্তু তাতে তৈরী হত নানান দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ। এই সবগুলো তরঙ্গ নিয়ে একসঙ্গে পরীক্ষা করা যায় না— তার জন্য কোনও একটা বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে বেছে নেওয়া দরকার। অলিভার লজ্ এর জন্য একটা উপায় বার করেছিলেন। তিনি দুই তারের

মাঝখানে একটা ধাতব বল যোগ করেলেন। কিন্তু কয়েকবার বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গের ধাক্কা খাওয়ার পর এই বলের ওপরকার পালিশ নষ্ট হয়ে যেত, এবং তার এবড়ো-খেবড়ো অংশ থেকে অন্যান্য দৈর্ঘ্যের— এবং যেসবের কোনও দরকার নেই এমন— তরঙ্গ বেরোতে শুরু করত।

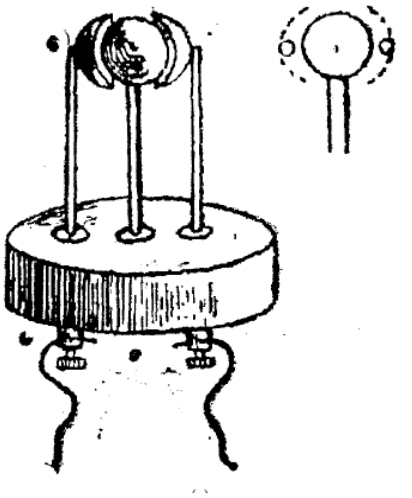

১ নং ছবি ॥ জগদীশ বসুর বানানো বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ তৈরীর যন্ত্র: দুই ধাতব অর্ধগোলকের মধ্যে একটা প্লাটিনাম দ্বারা মোড়া গোলক।

জগদীশ বসু সহজেই এর একটা প্রতিকার খুঁজে বার করলেন। তিনি দেখলেন যে ধাতব বলের ওপরটাকে প্লাটিনাম দিয়ে ঢেকে দিলেই সেটা ঠিক মত কাজ করে। তার পর তিনি আরও দেখলেন যে বলটাকে দুটো বিদ্যুতবাহী অর্ধগোলকের মধ্যে রাখলে এর ফল হয় আরও ভাল— অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এই গোলক দুটোর সাইজ়ের ওপর নির্ভর করবে কোন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এর থেকে বেরিয়ে আসবে— এটা একটা ফিল্টারের মত কাজ করে। যেমন, কোনও দোলনাকে তার স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধাক্কা দিলে দোলনাটা আরও বেশি দুলতে শুরু করে, কিন্তু অন্য ছন্দে ধাক্কা দিলে তার দোলন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে, ঠিক তেমনি। শুধু এক বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ এই গোলকদুটোর মধ্যে ঘুরে ফিরে উত্তেজিত হবে, আর অন্য দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলো মিইয়ে যাবে।

এই বার সঠিক দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ তৈরী হচ্ছে কি না সেটা যাচাই করার জন্য জগদীশ বসু তৈরী করলেন এই তরঙ্গের বর্ণালী পরীক্ষা করার যন্ত্র— যেভাবে আলোর বর্ণালী থেকে বোঝা যায় তার মধ্যে কোন কোন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ রয়েছে। আলোর রং নির্ভর করে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ওপর। তাই আলোর কোনও রশ্মির মধ্যে কী কী রং রয়েছে সেটা জানতে পারলে বোঝা যায় এর তরঙ্গসমষ্টির দৈর্ঘ্যের কথা। জগদীশ বসু মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের বর্ণালীর বিশ্লেষণের জন্য একটা নতুন যন্ত্র তৈরী করলেন। এই 'গ্রেটিং' যন্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ১৮৯৬ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া হয়— শুধু তাই নয়, পরীক্ষকরা মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এই ডিগ্রীর জন্য লন্ডনে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়ে আসার নিয়ম থেকে রেহাই দেন।

এর পর এল এইসব তরঙ্গের গ্রাহক যন্ত্র তৈরীর পালা। যেহেতু এই তরঙ্গের সঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের সম্পর্ক রয়েছে, তাই এর স্পন্দনে সাড়া দেবার জন্য বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে সাড়া দেবে এমন কোনও পদার্থকণা চাই— অর্থাৎ, ইলেকট্রন। আর এমন কোনও পদার্থ চাই যার মধ্যে

প্রচুর ইলেকট্রন স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করছে। সাধারণত, ধাতব পদার্থের মধ্যেই এমন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ দিয়ে ইলেকট্রনদের এমন নড়াচড়া করানোর মধ্যে একটা মারাত্মক অসুবিধে রয়েছে।

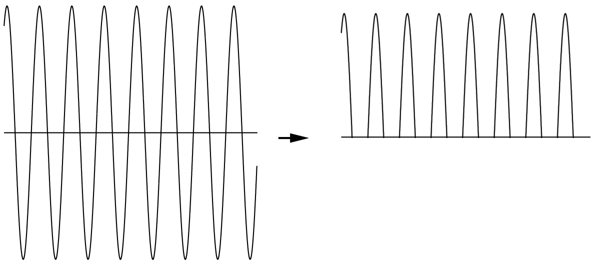

২ নং ছবি ॥ বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণের জন্য তরঙ্গের অর্ধেক অংশ ব্যবহার করা চাই।

যে কোনও তরঙ্গের ফল হল কোনও কিছুর হ্রাস-বৃদ্ধি। জলের তরঙ্গের মূল কথা হল কোথাও জলের উচ্চতার ওঠা-নামা; বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ হল বৈদ্যুতিক (এবং চুম্বকীয়) বলের কমা-বাড়া। এই তরঙ্গ যে দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার পথে কোনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মাপলে দেখা যাবে সেখানে বৈদ্যুতিক বল একদিকে ক্রমশ বাড়ছে তারপর কমছে। তারপর অন্যদিকে বাড়ছে— অর্থাৎ ঋণাত্মক হয়ে যাচ্ছে; তারপর আবার কমে গিয়ে আবার প্রথম দিকে বাড়তে শুরু করছে। এই বাড়াকমার মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব কম— মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের ক্ষেত্রে এক সেকেণ্ডের প্রায় ছয় হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ। (অর্থাৎ, এর ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক হল ছয় হাজার কোটি হার্ট্‌স্‌।) এই তরঙ্গ ধরার একটাই উপায়— কোনও ধাতব পদার্থের ইলেকট্রনগুলোকে এই তরঙ্গ দিয়ে এদিক ওদিক নাড়িয়ে বিদ্যুত প্রবাহ তৈরী করা। কিন্তু এত দ্রুত এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করলে ইলেকট্রনগুলো তো দিশেহারা হয়ে উঠবে— কোনও এক দিকে স্থির বিদ্যুত প্রবাহ তৈরী করতে পারবে না। গ্রাহক যন্ত্রে তরঙ্গের কোনও প্রভাবই পড়বে না।

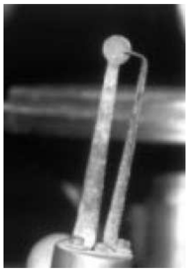

৩ নং ছবি ॥ জগদীশচন্দ্র বসুর তৈরী সূচ্যগ্র-সংযোগ গ্রাহক যন্ত্র।

এমন একটা ব্যবস্থা চাই যার সাহায্যে ইলেকট্রনগুলোকে শুধু এক দিকে চলতে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, তরঙ্গের শুধু অর্ধেক অংশ ব্যবহার করা হবে— যখন বৈদ্যুতিক বল একদিকে বাড়ছে

বা কমছে। যখন সে অন্যদিকে বাড়বে তখন যেন ইলেকট্রনরা উল্টোদিকে ছুটতে শুরু না করে। দুই দিকে সমান ভাবে চলতে দেওয়া যাবে না— কোনও এক দিকে তার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করা চাই।

এর জন্য জগদীশ বসু চেস্টা করলেন একটা সমতল লোহার পাতের ওপর লোহার সূচের মতন অংশ লাগিয়ে বিদ্যুত প্রবাহের মধ্যে কোনও অসম আচরণ পাওয়া যায় কি না। দুইদিকের ধাতুই লোহা, কিন্তু দুই দিকের লোহার টুকরোর আদল ভিন্ন বলে তাদের বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভিন্ন হবে। যেমন, সূচের মতন অংশের চারিদিকে ইলেকট্রনগুলো একটু ভিড় করে থাকবে। তার ফলে সমতল অংশ থেকে সূচের অংশে ইলেকট্রনের যাওয়া কস্টকর হবে, কিন্তু অন্যদিকে যাওয়া সহজ হবে। একটা উদাহরণ দিই— ধরা যাক কোনও মন্দিরে দর্শনার্থীদের খুব ভিড়। মন্দিরের ভেতরে বিগ্রহের সামনে লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার ফলে মন্দিরে বাইরে দর্শনার্থীদের বিশাল লম্বা লাইন পড়ে গিয়েছে; তাদের ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছে। অন্যদিকে পূজো সারার পর লোকজন চটপট ফিরে আসছেন। মন্দিরের ভেতরে যাওয়ার এবং মন্দির থেকে বেরিয়ে আসার 'প্রবাহের' মধ্যে একটু তফাৎ রয়েছে— একদিকে যাওয়া সহজ, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত কঠিন। জগদীশচন্দ্র বসুর যন্ত্রেও এমনটা হচ্ছে। এখানে সূচের মত অংশটা হল মন্দিরের গর্ভগৃহ: দর্শনার্থী অর্থাৎ ইলেকট্রনদের ভিড়ের জন্য এখানে ঢোকাটা কঠিন, কিন্তু পূজো দিয়ে বেরিয়ে আসা অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই ধরণের সূচ্যগ্র-সংযোগ বা 'পয়্যান্ট কন্ট্যাক্ট' ব্যবস্থায় জগদীশ বসু খুব ভাল ফল পেলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে এই ক্ষেত্রে বিদ্যুত প্রবাহ বৈদ্যুতিক বলের সমানুপাতিক নয়— তিনি পরিস্কার বুঝতে পেরেছিলেন এর সাহায্যেই বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ ধরা যাবে। এখন আমরা এর জন্য নানান ধরণের 'ডায়োড' ব্যবহার করে থাকি। বিদ্যুত প্রবাহের এই ধরণের অসম আচরণ 'ডায়োড'-এর সাধারণ ধর্ম বলে জানি।

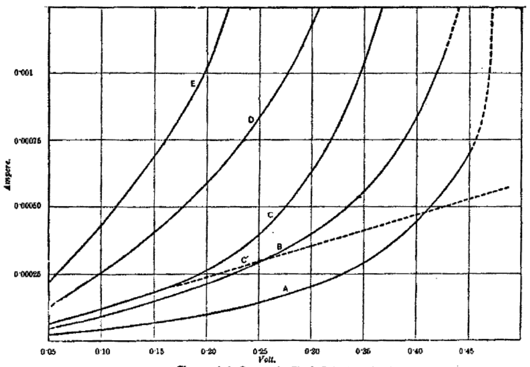

Characteristic Curves of a Single Point Iron Receiver.

৪ নং ছবি ॥ উপরোক্ত গ্রাহক যন্ত্রের বৈদ্যুতিক বল ও বিদ্যুত প্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এই দুইয়ের সম্পর্ক সমানুপাতিক নয়— মাঝখানের কাল্পনিক সরল রেখাটা সমানুপাতিক সম্পর্ক বোঝাচ্ছে। আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর জংশনের বৈশিষ্ট্যও এই রকম।

ঐ সময় অলিভার লজের বানানো 'কোহিয়ারার' বলে একটা গ্রাহক যন্ত্র ছিল (যেটা ব্র্যান্লি নামের এক ফরাসী বিজ্ঞানীর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে তৈরী)। এই যন্ত্রে লোহার গুড়ো ব্যবহার করা হত। দুই ধাতব পদার্থের টুকরো যদি এমনি গায়ে গায়ে লেগে থাকে, তখন তাদের ওপর হালকা বৈদ্যুতিক বল প্রয়োগ করলে তাদের মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহ দেখা যায় বটে, কিন্তু তার পরিমাণ হবে খুব সামান্য। কারণ ধাতুর মধ্যে যে ফাঁক রয়েছে, সেখানকার হাওয়া এই বিদ্যুত

প্রবাহে খানিকটা বাধা দেয়। কিন্তু দেখা গেল যে একটু জোরদার বৈদ্যুতিক বল প্রয়োগ করলেই এদের মধ্যে বিদ্যুত প্রবাহ হুট করে বেড়ে যায়। খুব সম্ভবত এই ক্ষেত্রে ধাতুর টুকরোর কোনও সূক্ষ্ম অংশ গলে গিয়ে বিদ্যুত পরিবহনের পথ সুগম করে দেয়। এমন একটা লোহার গুড়ো ভর্তি এবং দুই দিকে বৈদ্যুতিক তার লাগানো শিশি যদি বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গের রাস্তায় রাখা যায়, তাহলে তরঙ্গটা শিশি ভেদ করে যাওয়ার সময় শিশির দুইদিকের তারে এক ঝলক বিদ্যুত প্রবাহ দেখা দেবে— এই ধরণের ঝলক ব্যবহার করে টরে-টক্কা দিয়ে খবরাখবর পাঠানো যাবে।

জগদীশ বসু এই ধরণের যন্ত্রের মধ্যে লোহার গুড়োর বদলে স্প্রিং ব্যবহার করে ভাল ফল পেলেন। এই পর্যন্ত এসে মার্কনিও আর এগোন নি। কিন্তু জগদীশ বসু এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে একটা অন্য —আরও গভীর বিষয়ে চলে গিয়েছিলেন।

ইলেকট্রনের দুই দিকে চলার পথ অসম করার আরেকটা উপায় হল ইলেকট্রনের পথে দুটো স্তর তৈরী করা। আগের মন্দিরের দর্শনার্থীদের উদাহরণে ফিরে যাওয়া যাক। ধরা যাক এবার নিয়ম করে দেওয়া হল ঠাকুরের মূর্তির সামনে বেশি সময় দাঁড়ানো যাবে না, আর তাই গর্ভগৃহে ভিড় করে থাকার উপায় নেই। তখন মন্দিরে যাওয়ার ও সেখান থেকে ফিরে আসার মধ্যে খুব একটা তফাৎ থাকবে না।

এই ক্ষেত্রে দুই দিকের প্রবাহে অসমতা তৈরী করার আরেকটা উপায় আছে। যদি মন্দিরটা একটু উঁচুতে, কোনও পাহাড়ের ওপর হয়, তাহলে লোকজনের নিচে থেকে ওপরে যেতে কষ্ট হবে, আর তাই ওপরে যাওয়ার গতি যাবে কমে। অন্যদিকে ওপর থেকে নিচে বড়ো বড়ো পা ফেলে তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারবেন লোকজন।

তাহলে এমন দুটো বস্তুর সংযোগ ঘটাতে হবে যার মধ্যে ইলেকট্রনের শক্তির দুটো স্তর থাকবে। একদিকের বস্তুর মধ্যে তার শক্তির স্তর অপেক্ষাকৃত উঁচু, অন্যটায় নিচু। এর ফলে ইলেকট্রনদের একদিকে যাবার পথ সহজ হবে, উল্টোদিকে ফিরে আসা হবে কঠিন। জগদীশ বসুই দুই বস্তুর মধ্যে এমন 'দোতলা' সংযোগ ঘটিয়ে বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণ করার কথা ভাবতে শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন ধাতুর টুকরো জোড়া লাগিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন— কোন্ ধাতুর সঙ্গে অন্য কোন্ বস্তুর 'বিয়ে' দিলে এমনটা হতে পারে। বিভিন্ন ধাতু নিয়ে পরীক্ষা করতে জগদীশ বসুকে কলকাতার আবহাওয়ায় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। সহজেই ধাতুর ওপরকার অংশ জারিত হয়ে পড়ত — লোহার ক্ষেত্রে যাকে আমরা বলি মর্চে পড়া। কিন্তু এক দিক দিয়ে এই মর্চে পড়াটা তাঁর পক্ষে শাপে বর হয়েছিল, কারণ জারনের ফলে ধাতুর বিদ্যুত পরিবহণের ক্ষমতা পাল্টে যায়। তার বিদ্যুত পরিবহণ ক্ষমতা কমে যায়। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যুত পরিবহণের দুটো স্তর দেখা দেয়— যার সাহায্যে তরঙ্গ গ্রহণ করা সহজ হয়ে ওঠে।

আজকাল বিদ্যুত প্রবাহের ক্ষেত্রে এমন দুই স্তর তৈরীর জন্য ধাতুর সঙ্গে অর্ধ-পরিবাহী কোনও বস্তু— যাকে বলে সেমিকন্ডাক্টর— অথবা দুটো ভিন্ন ধর্মী সেমিকন্ডাক্টর ব্যবহার করা হয়। জগদীশ বসুর গবেষণাই সেমিকন্ডাক্টরের জগতের পূর্বসূরী।

শেষ পর্যন্ত ১৮৯৯ সালে তিনি লোহা এবং পারদ মিলিয়ে একটা গ্রাহক যন্ত্র তৈরী করলেন। বলা বাহুল্য, এই যন্ত্রটাই পরে মার্কনি ব্যবহার করে অতলান্তিক মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে সঙ্কেত পাঠিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

জগদীশ বসু এইখানে থেমে না থেকে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই দুই পদার্থের সম্মিলন — বা যাকে আজ আমরা 'পয়েন্ট কনট্যাক্ট জংশন' বলি — এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করে কয়েক বছরের মধ্যেই বার করলেন যে লোহা আর 'গেলেনা'-র বিয়ে দিলে বেতার তরঙ্গ গ্রহণে অসাধারণ ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই আবিষ্কারও হয়ত ইতিহাসের অন্ধকূপে হারিয়ে যেত যদি না স্বামী বিবেকানন্দ জগদীশ বসুকে এটার পেটেন্ট করানোর জন্য জোরাজুরি করতেন। বিবেকানন্দের সহায়তায় ১৯০১ সালে এই গেলেনা গ্রাহক যন্ত্রের জন্য অ্যামেরিকার পেটেন্ট অফিসে দরখাস্ত করা হয়, এবং ১৯০৪ সালে জগদীশ বসু এই পেটেন্টটা পান।

গ্রাহক যন্ত্র ছাড়াও জগদীশ বসু আরেকটি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন, যা এখনও রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি ১৮৯৫ সালে একবার কলকাতার টাউন হলে মাইক্রোওভ তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন। তখন সেখানে গ্রাহক যন্ত্রের সামনে একটা

কুপির মতন জিনিস লাগিয়েছিলেন— ধেয়ে আসা তরঙ্গকে ভাল করে ধরার জন্য। এটা দেখতে একটা ধাতব চোঙার মত; তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'কালেকটিং ফানেল'। আজকাল এটাকে হর্ন অ্যান্টেনা বলা হয়— এবং এমন অ্যান্টেনা অনেক জায়গায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৮৯৫ সালের জগদীশ বসুর ব্যবহৃত সেই চোঙাটাই পৃথিবীর প্রথম হর্ন অ্যান্টেনা।

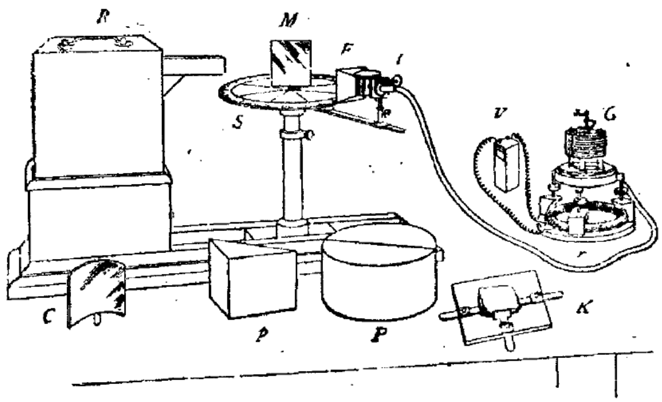

৫ নং ছবি ॥ মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ নিয়ে জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রপাতি। ছবিতে F নামাঙ্কিত ধাতব চোঙাটা দ্রষ্টব্য— এটাই পৃথিবীর প্রথম 'হর্ন অ্যান্টেনা' যা বর্তমানে রেডিও প্রযুক্তিবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে অপরিহার্য।

শুধু তাই নয়, এমন একটা ধাতব চোঙার মধ্য দিয়ে বিদ্যুত-চুম্বকীয় তরঙ্গ কীভাবে এগিয়ে যায়, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জগদীশ বসুর এই চোঙার কথা শুনে তাঁর শিক্ষক লর্ড র‍্যালে কলকাতায় এসেছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি এই নিয়ে প্রথম তাত্বিক বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন— তাঁর এই তরঙ্গ-বাহক বা 'ওয়েভ গাইড'-এর বিশ্লেষণ আজ পদার্থবিদ্যার প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর অবশ্যপাঠ্য। এই তরঙ্গ-বাহকের ওপর পরের যুগের গবেষণার ফলেই আজকে 'ফাইবার অপটিক্স' প্রযুক্তি সম্ভব হয়েছে, যার সাহায্যে বিশেষ নলের ভেতর দিয়ে আলোকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

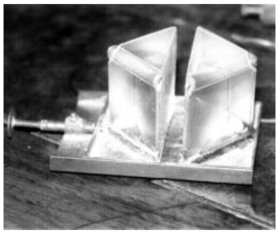

৬ নং ছবি ॥ মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের জন্য জগদীশচন্দ্র বসুর তৈরী জোড়া প্রিজ়ম।

এই মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ যেন জগদীশ বসুর কাছে সার্কাসের ঘোড়া ছিল, আর তিনি ছিলেন তার রিং মাস্টার। এই তরঙ্গগুলোকে তিনি যথেচ্ছা নাড়াচাড়া করতে পারতেন—

তার জন্য প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রপাতিও তৈরী করেছিলেন। এর মধ্যে একটা যন্ত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দুটো প্রিজ়মের সাহায্যে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের আলোড়ন ক্ষমতা নিজের ইচ্ছে মতন কমাতে পেরেছিলেন। দুটো প্রিজ়মকে যদি গায়ে গায়ে লাগিয়ে রাখা যায়, আর তার এক দিক দিয়ে তরঙ্গ পাঠানো যায়, তাহলে সেটা সহজেই অন্যদিকে চলে যেতে পারবে। কিন্তু যদি দুটো প্রিজ়মের মধ্যে একটু ফাঁক থাকে, তাহলে সেখানে ঢুকে পড়া হাওয়ার জন্য তরঙ্গটা পুরোপুরি অন্যদিকে যেতে পারবে না। তার এক অংশ একটা প্রিজ়মের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বাকি অংশ আগের মত সোজা চলে যাবে। এই ফাঁকটাকে কমালে বা বাড়ালে, তরঙ্গের এই দুই অংশের মধ্যে ভাগাভাগির অনুপাত কমানো-বাড়ানো যাবে। অর্থাৎ যদি কোনও পরিস্থিতিতে তরঙ্গের তীব্রতা কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজন পড়ে, তাহলে জগদীশ বসুর এই জোড়া প্রিজ়ম ব্যবহার করলেই হবে।

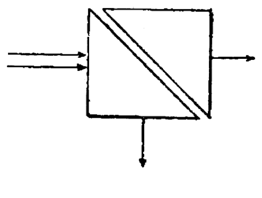

৭ নং ছবি ॥ জোড়া প্রিজ়মের উপযোগিতা ব্যাখ্যার জন্য জগদীশচন্দ্র বসুর অঙ্কিত ছবি।

জগদীশ বসু তাঁর জোড়া প্রিজ়মের কথা (‘ডাব্‌ল্ প্রিজ়ম অ্যাটেনুয়েটর’) বর্ণনা করেছিলেন ১৮৯৭ সালে। এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছিল প্রায় এক দশক পরে— ১৯১০ সালে। দুর্ভাগ্যের কথা, জগদীশ বসুর পরীক্ষার ব্যাপারটা সেখানে উল্লেখ করা হয় নি।

যখন বেতার সঙ্কেত গ্রহণ নিয়ে প্রথম ধাপের পরীক্ষাগুলো করা হয়েছিল, তখন গ্রাহক যন্ত্র তৈরীর একটা সুবিধে ছিল। কোন্ ফ্রিকোয়েন্সি বা স্পন্দনাঙ্কের তরঙ্গ পাঠানো হবে সেটা আগে থেকেই ঠিক করা থাকত। সেই বিশেষ কম্পনাঙ্কের কথা মনে রেখেই গ্রাহক যন্ত্র তৈরী করা হত। পরে যখন বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ধরার প্রশ্ন এল, তখন বার বার গ্রাহক যন্ত্রটিকে না বদলে যাতে একটা যন্ত্র দিয়েই সব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ধরা যেতে পারে এমন ব্যবস্থা করলেন বিজ্ঞানীরা। রেডিওতে যেমন একটা চাকা ঘুরিয়ে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ধরা যায়, — বা ‘টিউন্’ করা যায়, তেমন ব্যবস্থা। এর জন্য গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যেই একটা বিশেষ তরঙ্গ তৈরী করা হল, যার সঙ্গে মিশিয়ে আগত তরঙ্গের দৈর্ঘ্যেকে কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে— এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, এবং একে বলা হয় ‘হেটেরোডাইনিং’।

এমারসন তাঁর ১৯৯৮ সালের লেখা প্রবন্ধে অ্যামেরিকার একটা রেডিও টেলিস্কোপের কথা লিখেছেন। সেখানে মহাকাশ থেকে আসা মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ পর্যবেক্ষণের জন্য এই ‘হেটেরোডাইনিং’ পদ্ধতিতে গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে একটা তরঙ্গ তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে হলে গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে যে তরঙ্গটা তৈরী করা হচ্ছে, তার তীব্রতা খুব সাবধানে ঠিক করতে হয়। তার জন্য মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গটার তীব্রতা ইচ্ছেমতন কমানো-বাড়ানোর একটা ব্যবস্থা চাই। এই জায়গায় বিজ্ঞানীরা সাধারণত জগদীশ বসুর সেই জোড়া প্রিজ়ম ব্যবহার করে থাকেন।

জগদীশ বসু হয়ত কখনও ভাবেন নি যে তাঁর আবিষ্কার কখনও এই ভাবে ব্যবহৃত হবে। সাধারণ কোনও রেডিও তরঙ্গ নয়, একেবারে মহাকাশ থেকে আসা মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ। কিন্তু তাঁর মনে যে কখনও মহাজাগতিক তরঙ্গের কথা আসে নি তা নয়। কারণ তিনি একবার সূর্যের থেকে কোনও রেডিও দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ আসে কি না সেটা পরীক্ষা করেছিলেন।

তাঁর সেই পরীক্ষার বিশদ বিবরণ কোথাও নেই। শুধু ১৮৯৭ সালের রয়েল ইনিস্টিটিউশনের বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে সূর্য থেকে সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব

হয় নি [৩]। শুধু এই বাক্যটা ছাড়া আর কোনও বিবরণ নেই— অন্য কোথাও তিনি এই বিষয়ে লিখে থাকলে সেটা বর্তমান লেখকের জানা নেই। তিনি যে সেই সময়ে এমন একটা চেষ্টা করেছিলেন সেইটা ভেবেই অবাক হতে হয়। তিনি যদি সূর্যের তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হতেন, তাহলে হয়ত রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতও তাঁর একাধিক আবিষ্কারের তালিকায় যোগ হত।

কিন্তু এই খানেই লুকিয়ে ছিল ভাগ্যের একটা পরিহাস।

তিনি যে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ খুঁজছিলেন সেটা পৃথিবীতে বসে পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব। এবং তিনি সেটা অনুমানও করেছিলেন! সূর্যের তরঙ্গের কথা উল্লেখ করার পরেই তিনি বলেছিলেন যে হয়ত পৃথিবীর বায়ুমন্ডল এই তরঙ্গ শুষে নিচ্ছে! এটা তাঁর একটা অনুমান ছিল— কিন্তু আজ আমরা জানি এটা কতখানি সত্যি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় র‍্যাডার নিয়ে গবেষণার সময় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে আমাদের বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকা বাষ্প ১·২ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গকে শুষে নেয়। জগদীশ বসু ঠিক ওই মাপের তরঙ্গই পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেই তরঙ্গ তাঁর যন্ত্রে ধরা পড়ার কথাই নয়!

(জলের এই শোষণক্ষমতা ব্যবহার করে আজকাল ঘরে ঘরে মাইক্রোওয়েভ ওভেন কাজ করছে! আমাদের বেশির ভাগ খাবারের মধ্যেই কিছু পরিমাণ জল থাকে। তার ওপর মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ বিকিরণ করলে খাবারের ভেতরকার জল এই তরঙ্গ শোষণ করে গরম হয়ে ওঠে।)

আমরা আগে দেখেছি যে জগদীশ বসুর মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বছর পর বিজ্ঞানীরা সূর্য থেকে আরও বড়ো দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আবার শুরু হয় মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা— জগদীশ বসুর পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রায় পাঁচ দশক পরে। তারও দুই দশক পর অ্যামেরিকার নিউ জার্সিতে একটা হর্ন অ্যান্টেনার সাহায্যে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে আমাদের মহাবিশ্ব জুড়ে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ছড়িয়ে আছে।

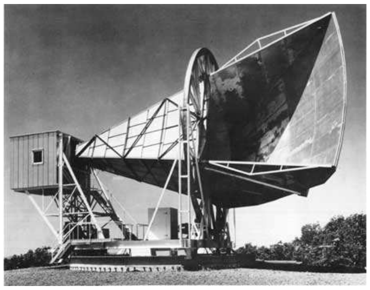

৮ নং ছবি ॥ এই হর্ন অ্যান্টেনা ব্যবহার করে ১৯৬৫ সালে পেনজ়িয়াস এবং উইলসন মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ আবিষ্কার করেছিলেন।

জগদীশ বসুই ১৮৯৫ সালে কলকাতার টাউন হলে এই ধরণের হর্ন অ্যান্টেনা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। আর্নো পেনজ়িয়াস এবং রবার্ট উইলসন-এর ব্যবহৃত অ্যান্টেনা অবশ্য আকারে অনেক বড় ছিল। তাঁরা এই হর্ন অ্যান্টেনার সাহায্যে ১৯৬৫ সালে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ আবিষ্কার করেছিলেন। এই বিকিরণের অস্তিত্বকে এখন ‘বিগ ব্যাং’-এর প্রমাণ বলে ধরা হয়। এই মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ মহাবিশ্বের প্রথম মুহূর্তের চিহ্ন; তার শৈশবের কান্নার প্রতিধ্বনি। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাই মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের ভুমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা কয়েকটা বড়ো বড়ো মাইক্রোওয়েভ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসানোর উদ্যোগ

নিয়েছেন। আগামী দশকে মাইক্রোওয়েভ জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা মহাবিশ্বের ইতিহাস নিয়ে আরও চমকপ্রদ খবরাখবর এনে দেবে বলে মনে হয়।

এই সব কথা মনে রেখে, জগদীশ বসুর ১৮৯৭ সালের সেই বক্তৃতাটা— যেখানে তিনি সূর্যের বিকিরিত মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের কথা উল্লেখ করেছিলেন— সেটা পড়ে ভাবতে ইচ্ছে করে তিনি যদি আরও কয়েক দশক পরে জন্মাতেন তাহলে কেমন হত?

১· Probir K. Bondyopadhyay, 1998, Proceedings of the IEEE, Vol 86, No. 1, pp. 218-285

২· Darrel Emerson, 1997, IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique, Vol 45, No. 12, pp. 2267-2273

৩· J. C. Bose, ”Collected Physical Papers”, New York, NY, Longmans, Green and Co. 1927, p. 88